A Peer-Reviewed Article
ISSN: 3136-9049
eISSN: 3136-9057

North Bengal International University Journal
https://journal.nbiu.edu.bd

বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে প্রফেসর তালুকদার মনিরুজ্জামানের পর্যবেক্ষণ: একটি মূল্যায়ন

Overview of Professor Talukdar Moniruzzaman on Bangladesh Politics: An Evaluation

Khadizatul Kobra*

Abstract

The main point is that Professor Talukder Moniruzzaman was a renowned scholar of Bangladesh and a Political Scientist whose reputation extended not only within Bangladesh but across the entire world. His political thoughts and consciousness not only identified political problems but also showed paths toward their solutions. From the period after creation of Pakistan up to 1971 and from 1971 to 2019 he made clear and insightful comments on political activities. These views and analyses have been discussed in this essay. He conducted research on contermporary politics and provided impartial and objective analysis from a philosophical perspective.

Keywords: Bangladesh, Poilitics, Military role, Six points, Bangladesh Krishak Sramik Awami League, Bangladesh Nationalist Party.

ভূমিকা

১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের রাজনীতি নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। গণতন্ত্র, সামরিক শাসন, দলীয় করণ, প্রশাসনিক দুর্বলতা, নির্বাচন ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন বাংলাদেশের রাজনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এসব বিষয় নিয়ে বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও গবেষক গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেছেন। তাদের মধ্যে প্রফেসর তালুকদার মনিরুজ্জামান অন্যতম। তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, গণতান্ত্রিক বিকাশ, রাজনৈতিক দলসমূহের আচরণ, নেতৃত্ব সংকট এবং সামরিক হস্তক্ষেপ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে, বাংলাদেশের

*Lecturer, Department of Political Science, North Bengal International University, Rajshahi, Bangladesh.

রাজনীতিতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক নেতৃত্ব, দুর্বল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং সংঘাত মুখী রাজনৈতিক সংস্কৃতিক গণতন্ত্রকে দুর্বল করেছে। এই গবেষণাপত্র বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে প্রফেসর তালুকদার মনিরুজ্জামানের পর্যবেক্ষণ সমূহ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা অনুধাবনে চেষ্টা করা হবে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে প্রফেসর তালুকদার মনিরুজ্জামানের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করাই এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। নিম্নে গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ করা হলো:

১. গণতন্ত্রের দুর্বলতার কারণ সম্পর্কে প্রফেসর তালুকদার মনিরুজ্জামানের মতামত চিহ্নিত ও মূল্যায়ন করা।
২. বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের কার্যক্রম সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন পর্যালোচনা করা।
৩. বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে প্রফেসর তালুকদার মনিরুজ্জামানের বিশ্লেষণের মূল্যায়ন করা।

গবেষণার গুরুত্ব

বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনীতি সম্পর্কে অনেকের আগ্রহ রয়েছে। তালুকদার মনিরুজ্জামান এই রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে একটি নির্মোহ ধরাবাহিক বর্ণনা দিয়েছেন। এই গবেষণা বাংলাদেশের রাজনৈতিক কাঠামো ও গণতান্ত্রিক বিকাশ বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বিশেষত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী, গবেষক ও নীতিনির্ধারকদের জন্য এটি কার্যকর হবে। এছাড়া বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমস্যাগুলোর ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বুঝতে এই গবেষণা সহায়ক হবে।

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

এই গবেষণায় প্রধানত গুনগত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস রেখে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গুনগত পদ্ধতিকে অধিক উপযোগী বিবেচনা করা হয়েছে। এ গবেষণায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় ধরনের তথ্যের উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসাবে প্রফেসর তালুকদার মনিরুজ্জামানের বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত বক্তৃতা, বই এবং গবেষকের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে, যা তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা প্রদান করে। অন্যদিকে মাধ্যমিক উৎস হিসাবে বিষয় সংশ্লিষ্ট বই, দেশি-বিদেশি একাডেমিক জার্নাল, বিভিন্ন গবেষণাপত্র, পত্রিকা, প্রকাশিত প্রতিবেদনও বিশ্লেষণধর্মী নিবন্ধ নির্ভরযোগ্য অনলাইন নিবন্ধ ও গবেষণা ভিত্তিক ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণার বিষয়বস্তুকে আরো নির্ভরযোগ্য করার চেষ্টা করা হয়।

বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে তালুকদার মনিরুজ্জামানের পর্যবেক্ষণ

বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে বিভিন্ন গবেষক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বিভিন্নভাবে আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের খ্যাতিমান অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামান একজন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি ছিলেন। দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে অনেক অমূল্য বই রচনা করেছেন, যে সব বাংলাদেশের রাজনীতির অমর গ্রন্থ। এসব পুস্তকে তার সুস্পষ্ট বক্তব্য তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশের রাজনীতি চর্চা করতে গেলে তাঁর বই পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন। জীবনে কোন চাওয়া-পাওয়ার দিকে খেয়াল না করে কেবল জ্ঞান সাধনাই করে গেছেন। বাংলাদেশের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয় নিয়ে তিনি নিরপেক্ষ হয়ে মন্তব্য করেছেন, যা ফুটিয়ে তুলেছেন মূল্যবান গ্রন্থে। সেটা সত্য তা বলেছেন অকপটে। তাঁর রচিত বইয়ের মধ্যে *Military Withdrawal from Politics* গুরুত্ব পেয়েছে অধিকতর। সারা বিশ্বে বইটি সমাদৃত হয়েছে। বইটি লেখার প্রেক্ষাপট হিসেবে উল্লেখ করেন যে, তিনি ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার জন্য রওনা দেন। অবশেষে ২৫ তারিখে যেতে না পেরে রাজশাহীতে ফিরে আসেন। তার কথায়; সত্য কথা বলতে কী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাক বাহিনীর উন্মত্ত আচরণ আর নগ্ন ভূমিকাই বিষয়টি নিয়ে লিখতে আমাকে আগ্রহী করে তোলে। ২৫ মার্চ রাতেই আমি সেনাবাহিনীর আক্রমনের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করি।”[১] ২৫ মার্চ রাতে তিনি ঢাকায় অবস্থান করেন। “সকালে জানালা দিয়ে দেখতে পাই এক নারীকে গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে। কারফিউ প্রত্যাহার হলে ঢাকা ছেড়ে কর্মস্থলে (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে) ফিরে আসার জন্য রওয়ানা দেই। মীরপুর ব্রীজের নীচে বহু মৃতদেহ দেখই পাই। পরে পাবনার গ্রামেও এরূপ ভয়াবহ দৃশ্য আমাকে দেখতে হয়েছে। তখনই ভেবেছিলাম, রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ বন্ধ করা সম্পর্কে একটি বই লিখবো।” আর এই বইটি হবে একটি অমূল্য গ্রন্থ। প্রখ্যাত সাংবাদিক মতিউর রহমান এক সাক্ষাৎকারে তাকে প্রশ্ন করেছেন যে, গ্রন্থটি লিখতে তার কতদিন সময় লেগেছে। উত্তরে প্রফেসর তালুকদার জানান, এজন্য তাকে ১০ বৎসর কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে।[২] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই পূর্ব বাংলার মানুষ বুঝতে পারে যে, তারা ব্রিটিশের গোলামী করার পর যে নতুন রাষ্ট্র পেল তাতে তাদের কোন লাভ হবেনা। প্রথম থেকেই বিমাতা সুলভ আচরণ প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রথম আঘাত আসে ভাষার উপর। রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হতে থাকে। এর প্রতিবাদ করাও যেন ছিল অপরাধ। অ্যারিস্টটল সত্যই বলেছেন যে, মানুষ সব সময় অন্যায় সহ্য করতে পারেনা। তারা এক সময়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠে। পূর্ব বাংলার মানুষ ক্রমে ক্রমে প্রতিবাদ মুখর হতে থাকে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য যে মুসলিমলীগ যারপর নেই সংগ্রাম করে, সেই দলের প্রতি এ অঞ্চলের মানুষ বিতশ্রদ্ধ হয়ে উঠে। এর প্রতিফলন ঘটে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের মাধ্যমে। উক্ত নির্বাচনে মুসলিমলীগের ভরাডুবি ঘটে। যুক্তফ্রন্ট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। মোট ২৩৭ আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২১৫টি আসনে জয়লাভ করে। নির্বাচনে মুসলিম লীগের কয়েকজন মন্ত্রী পাস করতে পারেননি। তাদের জামানত বাতিল হয়ে যায়।[৩] স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন বিপুল ভোটে পরাজিত হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক তরুন ছাত্রনেতার কাছে হেরে যান। কিন্তু

পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের কারণে ফজলুল মন্ত্রিসভা কয়েক সালের মাসে ৯২/ক ধারা বলে বাতিল করা হয়।[৪] ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক শাসন জারি হয়। এ সময়ের মধ্যে আবু হোসেন সরকার ও আতাউর রহমান অল্প সময়ের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে মন্ত্রিসভা গঠন করেন এবং ক্ষমতায় থাকেন। সামরিক শাসন জারির পর যেটুকু গণতন্ত্র ছিল তাও বিতারিত হলো। ইস্কান্দার মির্জাকে অল্প সময়ের মধ্যে জেনারেল আইয়ুব খান দেশ ছাড়া করে পাকিস্তানে শাসন ক্ষমতায় জোর করে জেঁকে বসেন। আইয়ুব সরকারের মন্ত্রিসভায় যাদের নেওয়া হয় তাদের মধ্যে ৮ জন ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পাস করতে পারেননি। মুসলিম লীগের এ সব জনধিকৃত নেতাকে মন্ত্রিসভায় স্থান দেবার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে।[৫] আইয়ুবের সেনা শাসনে বাঙালিরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ১০০ হাত দূরে ছিল। সে কারণে এ অঞ্চলের মানুষ প্রথম থেকেই আইয়ুব বিরোধী ভূমিকা পালন করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ১৯৬২-৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ৩৩ দিন ক্লাস হয়।[৬] ১৯৬৫ সালের নির্বাচনে আইয়ুবে বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতির প্রার্থী হিসেবে মিস ফাতেমা জিন্নাহকে দাঁড় করানোর জন্য ৯ জন নেতা তার সঙ্গে বাসায় সাক্ষাৎ করেন। তিনি রাজী হন। নির্বাচনে তিনি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে অধিক ভোট পান। পূর্ব পাকিস্তান ছিল বঞ্চিত প্রদেশ। নানাভাবে শোষণ করা হয় পূর্ব অঞ্চলের মানুষকে। পশ্চিম পাকিস্তানের ছোট প্রদেশগুলোও পাঞ্জাবিদের নিয়ন্ত্রণকে ভয় পেত। সবকিছু বিবেচনা করে তালুকদার স্যার বলেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে পূর্ব পাকিস্তান ছিল পাকিস্তানের একটি কলোনি মাত্র।[৭] সেজন্য ১৯৬৬ সালের ৬ দফা, ১৯৬৯ সালের আগরতলা মামলা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে বাংলার মানুষ ফুঁলে উঠে। এতে ছাত্র সমাজও সামিল হয় এবং অসামান্য ভূমিকা পালন করে। মুজিবের ৬ দফা আন্দোলন দারুন প্রভাব বিস্তার করে, কেননা এটা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের বাঁচার দাবি।[৮] আন্দোলন তুঙ্গে উঠলে শেখ মুজিব ও অন্যদের আগরতলা মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।[৯] অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আইয়ুব খান জেনারেল ইয়াহিয়ার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ইতিহাসের অন্তরালে চলে যান। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও জেনারেলরা ক্ষমতা হস্তান্তর না করতে ইয়াহিয়াকে পরামর্শ দেন। এমনকি তারা নির্বাচন দিতেও রাজি ছিলেন না, কেননা নির্বাচন দিলে আওয়ামী লীগ পাস করবে তাতে সন্দেহ ছিলনা। এই সমস্ত জেনারেলের মধ্যে জে. হামিদা, জে. টিক্কা, জে. পীরজাফা, জে. উমর, জে. গুলহাসান, জে. আকবর ও অন্যরা। নানা অজুহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফল আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়নি। সে কারণে মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠে। মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকাংশ ছিল নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। মুজিব বাহিনীর সদস্য ছিল ছাত্র ও ছাত্রলীগের কর্মীবৃন্দ।[১০] ভারত মুক্তিযুদ্ধে সত্য সহায়তা প্রদান করে। কিন্তু শেষের দিকে এসে ধারণা করা হয় যে, তারাই বাংলাদেশ স্বাধীন করে দিয়েছে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পনের মাধ্যমে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সমাপ্তি হয় এবং বাংলাদেশে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। শেখ মুজিব ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ দেশে ফিরে আসেন এবং ১২ জানুয়ারি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। মন্ত্রিসভায় সবাই প্রায় নবাগত। কেবল শেখ মুজিবের ৯ মাসের সরকার পরিচালনার অভিজ্ঞতা ছিল এবং অন্য জনের ১১ মাসের।[১১] নতুন সরকারের সামনে নানা প্রকার

চ্যালেঞ্জ আসতে থাকে। শেখ মুজিব দেশে ফিরার পূর্বে অনেক ইসলামি বাক্যের পরিবর্তন হয় কিন্তু তিনি আসার পর প্রচুর ইসলামি শব্দ ব্যবহার করেন। যেমন: বিসমিল্লাহ, আল্লাহ হাফেজ ইত্যাদি। এতে করে মানুষের মনের ক্ষোভ দূর হয়।[১২] স্বাধীনতার পর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনায় অনেক দল সামিল হয়। বিশেষতঃ স্বাধীনতা বিরোধী গোষ্ঠীগুলো আত্মগোপন করে এবং সরকার উৎখাত করার জন্য সশস্ত্র কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়।[১৩] খুন জখম যেন নিত্য দিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। জাতীয়তাবাদী সমাজতান্ত্রিক দল (১৯৭২ জাসদ) বলে তাদের ৪ হাজার কর্মী হত্যা করা হয়েছে। সাম্যবাদী দল ৩৫০০ হত্যার অভিযোগ করে। সর্বহারা পার্টির সিরাজ শিকদার পুলিশ হেফাজতে থাকা অবস্থায় নিহত হন। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় বিরোধী দলগুলো কর্তৃক ১৯৭২-৭৫ মধ্যে ৪ জন সংসদ সদস্যসহ ৩ হাজার নেতা কর্মীকে হত্যা করা হয়।[১৪] স্বাধীনতা উত্তর অপরিকল্পিত জাতীয়করণ, ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে অনিয়ম, মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্য-সামগ্রীর অত্যাধিক দাম রীতিমত রেকর্ড সৃষ্টি করে। সঙ্গে সঙ্গে আইন শৃঙ্খলা ধ্বস সমস্যাকে আরো অসহনীয় করে তুলে। ১৯৭২ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে দুস্কৃতিকারিদের হাতে ৪৯২৫ জন নিহত হয়। এ সময়ে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় ২০৩৫টি, ৩৩৭ জন নারী অপহৃত হন এবং ১৯০ জন ধর্ষিত হন। ডাকাতি সংঘটিত হয় ৪৯৫৭টি। ১৯৭৩ সালের ৫ মাসের মধ্যে ৬০টি থানা লুট করে সন্ত্রাসীরা অস্ত্র নিয়ে যায়।[১৫] ঐ সময়ে প্রচুর অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়। এর সঙ্গে জড়িত থাকে নিজেদের লোকই। এর ফলে মুজিব জনগণ থেকে অনেক দূরে সরে যান।[১৬] জনপ্রিয়তা সুপ্রতিষ্ঠার জন্য আওয়ামী লীগ জোটবদ্ধ হবার প্রয়োজন অনুভব করে। সে অনুসারে ১৯৭৩ সালের আগস্ট মাসে শেখ মুজিব তিন দলের গণঐক্য জোট করতে আগ্রহী হন। সেপ্টেম্বর মাসের ৩ তারিখে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ মোজাফ্ফর ও সিপিবি এক বৈঠকে তিন দল এক জোটে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়। জোটের প্রধান লক্ষ্য হল দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং এ পথের সকল বাধা দুরীকরণ। ঘোষণা পত্রে আরও বলা হয় যে, রাষ্ট্রের ৪ নীতির ভিত্তিতে দেশের স্বাধীনতা, সংহতি এবং দুস্কৃতিকারি চোরা কারবারি ও স্বাধীনতার শত্রুদের উৎঘাত করার ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করবে। ইতোমধ্যে দেশ দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ হল, দ্রব্য সামগ্রী ভারতে পাচার হয় দেদারছে। ভারতে পাটের মূল্য বৃদ্ধি করে, ফলে অসাধু ব্যবসায়ীরা পাট পাচার করে প্রচুর সম্পদের মালিক হয়। দুর্ভিক্ষের সময় হিসাব অনুসারে ২৭০০০ লোক নিহত হয়। বঙ্গবন্ধু প্রচুর খাদ্য-শস্য বিদেশ থেকে আমদানি করেন কিন্তু অসাধু ব্যবসায়ীরা দেশের মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে তা অবাধে আত্মসাত করতে থাকে। দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে দেশ ভয়ানক সংকটের আবর্তিত হয়। শেখ মুজিব এই সব দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে অনেক প্রকার হাম্বি-তাম্বি করলেও শেষ পর্যন্ত কিছুই করতে পারেননি। তাই শেষে আক্ষেপ করেছেন।[১৭] মুজিব সরকারের সংকটের অন্য একটি কারণ হলো সেনাবাহিনীর সমান্তরালে রক্ষী বাহিনী সৃষ্টি করা। রক্ষী বাহিনীর প্রশিক্ষণ হয় ভারতে। রক্ষী বাহিনীতে মুজিববাহিনীর সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় ভারতের দেরাদুলে। সরকার সেনাবাহিনীকে অবজ্ঞার চোখে দেখে। রক্ষী বাহিনীর সুযোগ-সুবিধা যেমন বৃদ্ধি পায় সেনাবাহিনীর তদনুরূপ নয়। প্রমাণ হিসেবে বলা যায় যে, রক্ষী বাহিনীর

জন্য যেমন বাজেট বৃদ্ধি পায়, তেমনি সেনা বাহিনীর বাজেট কমতে থাকে। তাতে করে সুযোগ-সুবিধার বেলায়ও অনিয়ম দেখা দেয়।[১৮] পাকিস্তান থেকে সেনা সদস্যরা ফেরত এলে আরও এক সমস্যার সৃষ্টি হয়। রক্ষী বাহিনী সেনা বাহিনীর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হয়। রক্ষী বাহিনী নানা প্রকার অনিয়ম করতে থাকে। এক সময়ে রক্ষী বাহিনীর কার্যকলাপের আদালত ভর্ৎসনা করে।[১৯] ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় ছিল অনিবার্য, তবুও ঐ নির্বাচনে কারচুপি হয়। একজন বিদেশী সংবাদকর্মী মন্তব্য করেন যে, জাতিসংঘ বা Read Cross Society নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করলেও মুজিব জয়লাভ করতেন। তবুও নির্বাচনে প্রচুর অনিয়ম হয়।[২০] দেশের অবস্থা ক্রমান্বয়ে খারাপ হতে থাকে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট জরুরি অবস্থা জারি করেন। দেশে যে ক্রান্তিকাল চলছিল এটাই তার প্রমাণ। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী চতুর্থ সংশোধনী গৃহীত হবার অব্যবহিত পরেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন এবং মনসুর আলীকে প্রধানমন্ত্রী করে নতুন মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেন। নতুন মন্ত্রী পরিষদে পূর্বতন মন্ত্রিসভার প্রায় সকল সদস্য অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ অর্থাৎ “বাকশাল” নামে দেশে একটি মাত্র “জাতীয় দল” গঠন করেন। যার ফলে অন্য সকল রাজনৈতিক দলের বিলুপ্তি ঘটে।[২১] আওয়ামী লীগের দল তার অনেক সদস্যের সমর্থন ছিল না, কিন্তু বাধ্য হয়ে তারা সমর্থন করেন। তালুকদার এটাকে সাংবিধানিক ক্যূ বলে অভিমত দিয়েছেন। এর প্রধান কারণ ছিল বিরোধী মতকে সমূলে বিলোপ করা।[২২] তিনি ব্যক্তিগতভাবে বাকশাল গঠন সমর্থন করেননি এবং বাকশালে যোগ দেননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকই প্রায় যোগ দিলেও তালুকদার স্যার তাতে যোগ দেননি।[২৩] ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনকসহ অন্যদের হত্যা একটি নিষ্ঠুর ঘটনা। তিনি প্রবল সমালোচনা করেছেন। এ হত্যাকাণ্ডের পর তিন বাহিনীর প্রধান মোশতাক সরকারের প্রতি সমর্থন জানান এবং এ পরিবর্তনকে মেনে নেন। এটা মনে করা হয় যে, সেনা বাহিনীর তিন জন পদচ্যুত অফিসারসহ ২০-২৫ জন মেজর ও ক্যাপ্টেন ও গোলণ্ডাজ বাহিনীর ১৪ শত সৈন্যের এক বাহিনী ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থান ঘটায়।[২৪] মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানসহ কতিপয় উর্ধ্বতন সামরিক অফিসার এ অভ্যুত্থান সম্পর্কে পূর্বেই অবগত ছিলেন কিন্তু তাঁরা তা দমনের কোন চেষ্টা করেননি, কিংবা ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করেননি। তাছাড়া এ অভ্যুত্থান পরিকল্পনায় খন্দকার মোশতাক আহমদসহ কতিপয় মার্কিন পন্থী আওয়ামী লীগ নেতা জড়িত ছিলেন। এস.ই. ফাইনারের মতে, সাময়িক অভ্যুত্থানের পিছনে দুটি উপাদান কাজ করে: ক) ক্ষমতা দখলের প্রবৃত্তি। খ) ক্ষমতা দখলের সুযোগ। ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের পিছনে সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখলের প্রবৃত্তি ও সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল।[২৫] হত্যাকাণ্ডের পর মোস্তাক সরকার আহুত সংসদে সকল সদস্যই অংশ নেন। তবে অনেক সদস্য হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেন। তারা মোস্তাককে খুনি বলে ধিক্কার দেন।[২৬] শেখ মুজিব নিহত হবার পর মোশতাক সরকার মাত্র ১৮০ দিন ক্ষমতায় থাকতে সক্ষম হয়। ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানকারীরা আওয়ামী লীগের ডানপন্থী গোষ্ঠীর নেতা খন্দকার মোশতাক আহমেদকে রাষ্ট্রপতি পদে আসীন করে। খন্দকার মোশতাক আহমেদ দেশে

সামরিক আইন জারি করেন। কিন্তু সংবিধান বাতিল করেননি। তিনি ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে 'সার্বভৌম' সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দেন। মোশতাক ইতোমধ্যে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান নিযুক্ত করেন। মোশতাক নিজস্ব রাজনৈতিক দল গঠন না করে আওয়ামী লীগকে তাঁর ক্ষমতার বাহন হিসেবে ব্যবহার করেত চান কিন্তু আওয়ামী লীগের মূল অংশ তাঁকে সমর্থন করতে অস্বীকার করে। তিনি সেনাবাহিনীর নিকট হতে ও উল্লেখযোগ্য সমর্থন পাননি। কারণ অভ্যুত্থানকারীরা ঊর্ধ্বতন সামরিক মহলকে অবজ্ঞা করে বঙ্গভবনে অবস্থান গ্রহণ করে এবং সেখান হতে মোশতাক সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। এর ফলে ঊর্ধ্বতন সামরিক নেতাদের এক অংশ অসন্তুষ্ট হয়। এই প্রেক্ষাপটে তৎকালীন সেনাবাহিনীর উপ প্রধান বিগ্রেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর মোশতাককে ক্ষমতাচ্যুত করেন। তিনি জেনারেল জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দী রেখে নিজে সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান হন এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন। জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়া হয়। তবে সংবিধান বাতিল করা হয়নি। ৩ নভেম্বর এর অভ্যুত্থান ছিল ক্ষণস্থায়ী। সামরিক বাহিনী ও রাজনৈতিক এলিটদের বড় অংশ এ অভ্যুত্থানকে ভারতের প্রভাব পুন: প্রতিষ্ঠার এক চক্রান্ত বলে মনে করে। ৭ নভেম্বর এক সিপাহী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে খালেদ মোশাররফকে হত্যা করে জেনারেল জিয়াকে মুক্ত করা হয়।[২৭] এক সামরিক অভ্যত্থানের মাধ্যমে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। পরবর্তীতে সিপাহী জনতার সমর্থনক্রমে জিয়াউর রহমান ক্ষমতা পদপীঠে অধিষ্ঠিত হন। ক্ষমতার বৈধতা পাবার জন্য গণভোটের আয়োজন করেন। সেটাকে বলা হয় হ্যাঁ-না ভোট। জিয়া উক্ত গণভোটে প্রায় ৯৮% সমর্থন পেয়ে রাষ্ট্রপতি হন। এটা কোন সুষ্ঠু নির্বাচন ছিল না। সেজন্য তিনি বলেন এটা ছিল একটা রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজী।[২৮] জিয়াউর রহমান ১৯৭৬ সালের জুলাই মাস থেকে সীমিতভাবে রাজনীতি করার অনুমতি দেন। দলবিধি জারির পর সীমিতভাবে রাজনীতি করার অধিকার পাওয়া যায়। তিনি বলেন, ১৯৭৬ সালের শেষে ৬০টি রাজনৈতিক গোষ্ঠী এ উদ্দেশ্যে তাদের সাংবিধানিক ও আনুসঙ্গিক তথ্য জমা দেয়। এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগসহ ২১টি দলকে রাজনীতি করার অনুমতি দেওয়া হয়।[২৯] জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর লোক, বিধায় প্রশাসনে সামরিকীকরণ হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, প্রশাসনের অনেক স্থানে অবসরপ্রাপ্ত সেনা অফিসারদের বসানো হয়। ২০টি জেলার মধ্যে ১৪টির এস.পি. ছিলেন সামরিক কর্মকর্তা। তার সময় অনেক সেনা অভ্যুত্থান হয়, তবে তিনি সেনা বাহিনীর শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন।[৩০] জিয়াউর রহমান রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব মীমাংসা করার জন্য ১৯৮১ সালের মে মাসের ৩০ তারিখ চট্টগ্রাম গমন করেন। যেখানে তিনি নির্মামভাবে নিহত হন। মেজর জেনারেল মঞ্জুরের সহযোগিতায় জিয়াকে হত্যা করা হয়। মঞ্জুর ছিলেন উচ্চবিলাসী অফিসার।[৩১] এ সময় সেনাদের মধ্যে শৃঙ্খলা একদম ভেঙ্গে পড়ে। তবে শেখ মুজিব নিহত হবার পর জিয়াউর রহমান বলেছিলেন যে, রাষ্ট্রপতি নেই তাতে কী হয়েছে, উপরাষ্ট্রপতি আছেন।[৩২] সেনা প্রস্তুত রাখো- সংবিধান রক্ষা করো। এটা বলা হলেও সেনা প্রধান বা উপ-প্রধান এ বিষয়ে কোন কিছু করেননি। কিন্তু জিয়া নিহত হবার পর ভাইস-প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্রপতি

হন কিন্তু এরশাদ হঠকারিতা করে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ ক্ষমতা কেড়ে নেন।[৩৩] এরশাদ সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে উঠে। এদেশের ছাত্র, শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবী জনসমাজ জেনারেল এরশাদের প্রভাব শাসনক্ষমতা গ্রহণকে সহজে মেনে নিতে পারেনি। পরিবহন শ্রমিক এবং চট্টগ্রাম পোর্টের শ্রমিকরা সর্বপ্রথম এরশাদ বিরোধী প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ছাত্র সমাজ সামরিক আইনের বেড়াজাল ছিন্ন করার জন্য গড়ে তোলে দুর্বার সংগ্রাম। ১৯৮৭ সালের জানুয়ারি মাস আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে '১৫ দলীয় ঐক্যজোট।' ১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের বুকের রক্তে সূচিত হয় রাজপথের সংগ্রাম। ১৯৮৩ সালের সেপ্টম্বর মাস বি.এন.পি নেতৃত্বে গড়ে ওঠে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন এতে প্রায় সকল দলই সামিল হয়।[৩৪] অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আওয়ামী লীগ ও বি.এন.পি কিন্তু সেই সময়ে দুই দল বা দুই জোট এক হতে পারেনি। যদি এক হতে পারত তবে এরশাদ সামরিক সরকারের পতন তখনই হয়ে যেত। ১৯৮৬ সালে হঠাৎ আওয়ামী লীগ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে এরশাদের অধীন নির্বাচনে অংশ নেয়। এরশাদ সরকারের সম্পর্কে নানা মন্তব্য করেছেন। তিনি প্রশাসনকে সামরিকীকরণ করে ফেলেন। বিভিন্ন কর্পোরেশনে ২২ জন সেনা কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেন। বিদেশী মিশনগুলোতে একতৃতীয়াংশ সেনা কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়। ক্যাবিনেটের ৪০% সদস্য ছিলেন সেনাবাহিনীর লোক। বাংলাদেশের পরবর্তী রাজনীতি নিয়ে তিনি অনেক মন্তব্য করেছেন। তাঁর উপর উচ্চতর একটি ডিগ্রী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। উদাহরণসহ বলা যায়, এরশাদ হঠাও আন্দোলনে সকল দল এক হয়। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি প্রধান ভূমিকা পালন করে। অবশেষে, এরশাদ বিদায় হন এবং রূপরেখা অনুসারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত হয়। তখন একটা জাতীয় ঐক্য হলেও বিবিসি ও ভোয়াকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, এ ঐক্য বেশিদিন থাকবেনা বলে মনে হয় না, কেননা কেউ জয় বাংলা এবং কেউ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।[৩৫]

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

১. গবেণষাটি মূলত মাধ্যমিক তথ্যের উপর নির্ভরশীল। যে যদি জীবিত থাকত তাহলে তাঁর বিষয় ভালোভাবে জানা যেত।
২. সময় ও তথ্য প্রাপ্তির সীমাবদ্ধতার কারণে সকল রাজনৈতিক ঘটনা বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি।
৩. প্রফেসর তালুকদার মনিরুজ্জামানের সব লেখা ও সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করা যায়নি।
৪. বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনশীল হওয়ায় কিছু তথ্য সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হতে পারে।

মূল্যায়ন

১. প্রফেসর তালুকদার মনিরুজ্জামান বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।
২. তাঁর মতে, স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রগঠন ছিল অত্যন্ত জটিল একটি প্রক্রিয়া।
৩. তাঁর মতে, বাকশাল রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনার উদ্দেশ্য গঠিত হলেও এটি গণতান্ত্রিক বহুত্ববাদকে সীমিত করেছিল।

৪. তাঁর মতে, জিয়াউর রহমান বহুদলীয় রাজনীতি পুনঃপ্রবর্তন করলেও সামরিক প্রভাব পুরোপুরি দূর করতে পারেননি।
৫. প্রফেসর তালুকদার মনিরুজ্জামান মতে, নির্বাচন গণতন্ত্রের অপরিহার্য অংশ হলেও নির্বাচনকে ঘিরে বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতা সংকট বারবার দেখা দিয়েছে।

উপসংহার

উপরোলোচিত বিষয়ের আলোকে বলা যায়, অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামানের রাজনৈতিক ভাবনা ও বিশ্লেষণ বাংলাদেশের রাজনীতিকে বস্তুনিষ্ঠভাবে অনুধাবন করার জন্য এক অমূল্য দলিল। দেশভাগের পর পাকিস্তান আমলের শাসনতান্ত্রিক বৈষম্য, উগ্র-বাম ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং পরবর্তী স্বাধীনতা-উত্তর শেখ মুজিব, জিয়াউর রহমান ও এরশাদ শাসনের উত্থান-পতনকে তিনি দার্শনিক ও একাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যে, দলীয় স্বার্থের প্রাধান্য, সংঘাতমুখী রাজনীতি, গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিকতার ঘাটতি এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে বারবার বাধাগ্রস্থ করেছে। অধ্যাপক মনিরুজ্জামানের রাষ্ট্রচিন্তা কেবল রাজনৈতিক সংকট ও ক্ষমতার দ্বন্দে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তা সংকট উত্তরণের দিকনির্দেশনাও প্রদান করেছিল। অতএব, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের গতিধারা বুঝতে এবং ভবিষ্যতে কার্যকর, টেকসই ও গণমুখী গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে রাজনৈতিক দলগুলোর সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল আচরণ, সংহতি প্রতিষ্ঠা এবং তাঁর এই নিরপেক্ষ রাজনৈতিক দর্শনের অনুসরন অত্যন্ত জরুরি।

তথ্যনির্দেশ ও টিকা

[১] মতিউর রহমান, ইতিহাসের সত্য সন্ধানেঃ বিশিষ্টজনদের মুখোমুখি (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশ, ২০১৭), পৃ. ১১২।

[২] তদেব, পৃ. ১১৪।

[৩] Talukder Maniruzzaman, Radical Politics and the Emergence of Bangladesh (Dhaka:Bangladesh Book International, 1974) p. 34

[৪] মোঃ মাহবুবুর রহমান, বাংলাদেশের ইতিহাসঃ ১৯৪৭-৭১, ৩য় বর্ধিত সংস্করণ (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০৩), পৃ. ১৩০-১৩১.

[৫] Talukder Maniruzzaman, Radical Politics and the Emergence of Bangladesh, Opcit, p. 34.

[৬] Talukder Maniruzzaman, Group Interests and Political Changes: Studies of Pakistan and Bangladesh (New Delhi: South Asian Publishers, 1982), pp. 10-11, 99.

[৭] Talukder Maniruzzaman, The Politics of Development: The Case of Pakistan (Dacca: Green BookHouse, 1970, pp 41-42).

[৮] Talukder Maniruzzaman, The Bangladesh, Revolution and Its Aftermath (Dhaka: UPL, 1988), pp. 19-20.

[৯] Crises in Political Development and the Collapse of Ayub Regime in Pakistan; The Journal of Development Areas: vol. 2, 1972.p.232.

[১০] Talukder: The Bangladesh Revolution, opcit, p. 113-115.

[১১] Talukder Maniruzzaman, Military Withdrawal from Politics: A Comparative Study (Dhaka: UPL, 1988), p. 108.

[১২] আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, (ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল, ২০০২), পৃ. ৫৯৪।

[১৩] Talukder, Maniruzzaman “Bangladesh: An Unfinished Revolution” Journal of Asian Studies, Vol. xxxi , No. 4, 1975, P. 165.

[১৪] Talukder, The BangladeshRevolution, opcit, p. 164.

[১৫] Talukder, Group Interests, opcit, p. 147.

[১৬] Talukder, The Bangladesh Revolution, opcit, pp.159-160; 166.

[১৭] Talukder, Politics and Security of Bangladesh (Dhaka: UPL, 1994), p. 54.

[১৮] Talukder Group Interest, opcit, p 173.

[১৯] মওদুদ আহমদ, বাংলাদেশ: শেখ মুজিবের শাসন, (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৭), পৃ. ৮১।

[২০] Talukder, opcit, p 157.

[২১] ড. আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, ৪র্থ পরিমার্জিত সংস্করণ (ঢাকা: অনন্যা, ২০১৮), পৃ. ১৬৭।

[২২] Talukder, Bangladesh in 1978; The Fall of Mujib Regime and Its Aftermath Asian Survey, Feb 1976, p. 120.

[২৩] তালুকদার মনিরুজ্জামান সাক্ষাৎকার, প্রথম আলো ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

[২৪] Talukder, Bangladesh in 1975, Asian Survey, vol. 16, 1976, p. 122.

[২৫] ড. আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, ৪র্থ পরিমার্জিত সংস্করণ (ঢাকা: অনন্যা, ২০১৮), পৃ. ১৬৮।

[২৬] Talukder, Group Interests, opcit, p. 176.

[২৭] ড. আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, ৪র্থ পরিমার্জিত সংস্করণ (ঢাকা: অনন্যা, ২০১৮), পৃ. ১৭১।

[২৮] Talukder, The Bangladesh Revolution, opcit p. 216.

[২৯] Ibid, p. 214.

[৩০] Ibid, PP. 203-2 10,223.

[৩১] Talukder, Group Interests, opcit, p. 249

[৩২] এমাজউদ্দীন আহমদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, ২৫ তম সংস্করণ (ঢাকা: বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিমিটেড, ২০১৫), পৃ. ৪২১।

[৩৩] জমিরউদ্দীন সরকার, বাংলাদেশের গণতন্ত্রের উন্নয়ন ও ডিগবাজী, (ঢাকা: ক্যাথাসির্স পাবলিশিং, ২০২৪), পৃ. ৬২-৬৬।

[৩৪] আব্দুর রহীম আযাদ ও শাহ আহমদ রেজা ‘বাংলাদেশের রাজনীতি: প্রকৃতি ও প্রকাশ‘ ২১ দফা থেকে ৫ দফা (ঢাকা: সমাজবিজ্ঞান গবেষনা কেন্দ্র, ১৯৮৭), পৃ. ৩০৯।

[৩৫] তালুকদার মনিরুজ্জামান, সাক্ষাৎকার, BBC News.